OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 11
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 06 - 11
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নারী বঞ্চনার আখ্যান : প্রেক্ষিত আধুনিক বাংলার রূপকথার গল্প

ড. শ্রাবণী ভৌমিক
অতিথি প্রভাষক
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়, বিলোনিয়া

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Discussion

মানুষের মনের ভাব–ভালোবাসা, ইচ্ছা–অনিচ্ছা, আবেগ-অনুভূতিগুলোকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার অদম্য স্পৃহা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের। যে কোনো দেশের সাহিত্যে সাধারণত দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক, মৌখিক সাহিত্য, দুই লিখিত সাহিত্য। লিখিত সাহিত্য জনসমাজে প্রচলিত হওয়ার আগে মৌখিক সাহিত্যেরই প্রচলন ছিল বেশি। তবে সময় যত এগিয়েছে, মৌখিক সাহিত্যের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। ক্রমে মৌখিক সাহিত্যে লোকছড়া, রূপকথা, উপকথা ও নীতিকথার মতো প্রভৃতি বিষয়ও যুক্ত হয়েছে। ইংরেজ বণিকরা এদেশে আসার আগে এই মৌখিক সাহিত্য গুলিই ছিল বাঙালি শিশুর নিজস্ব সম্পদ -

> "ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে পর্যন্ত, অথবা ইংরাজী শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এগুলিই বাঙালির নিজস্ব শিশু সাহিত্য, তাহার মৌলিক সম্পদ।"[১]

প্রাচীন কালে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যগুলি থেকেই উনিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সূচনা ঘটেছিল।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একটি অন্যতম উপাদান হল রূপকথা। এই রূপকথা লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে শিশুদের শান্ত রাখতে মা, মাসিমা ও ঠাকুমারা মুখে মুখেই রূপকথার গল্প জাল বয়ন করতেন। এই বিষয়টি আমরা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'জীবনালেখ্য' থেকেও জানতে পারি -

> "প্রয়াত মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে দক্ষিণারঞ্জন লাভ করেছিলেন জীবনের পরম সম্পদ-রূপকথার রস। প্রতি সন্ধ্যায় রূপকথার প্রতি পুত্রের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলতেন তিনি কথাকাব্যের মধুরস সংযোগে।"[২]

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই রূপকথার গল্প প্রচলিত রয়েছে। আমাদের পৃথিবীতে ঠিক কবে থেকে এই রূপকথার প্রচলন হয়েছে তা নিয়ে আজও মতবিরোধ আছে। তবে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে লিখিতভাবে রূপকথার প্রচলন হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তিনিই প্রথম বিদেশী রূপকথাকে বাংলায় অনুবাদ করেন। ক্রমে বিশ শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রথম এদেশীয় রূপকথাকে সংকলন করতে শুরু করেন। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পারি তাঁর- 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯), 'ঠানদিদির থলে' (১৯০৯) প্রভৃতি গ্রন্থে। রূপকথামূলক এই গল্পগুলি ছোটদের মনোরঞ্জনের এক বড় উৎস ঠিকই, কিন্তু আমরা একটু গভীরভাবে

অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে, রূপকথার এই গল্পগুলির পরতে পরতে নারী বঞ্চনার চিত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। ফলত রূপকথায় নারীদের এই বঞ্চনার জায়গাটি আমাদেরকে ভাবিয়েছে। সেই কারণেই পাঠকদের সামনে এ বিষয়টিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

রূপকথার গল্প সংগ্রাহক হিসেবে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। কারণ তিনিই প্রথম এদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা মা, ঠাকুমাদের মুখের বুলিকে অনুসরণ করে তা সাহিত্যে তুলে ধরেন। তাঁর সংগৃহীত রূপকথায় আমরা বহু বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত নারী চরিত্রের সমাহার লক্ষ করতে পারি। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে আমরা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলির* (১৯০৭) 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের উল্লেখ করছি। গল্পের শুরুতেই দেখি, এক রাজ্যে এক নিঃসন্তান রাজা ছিলেন। তার সাত রানিই ছিলেন বন্ধ্যা। একদিন এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তার সাত রানির গর্ভেই সন্তান আসে। কিন্তু সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড়ের ভালো অংশ যে পাঁচ রানি খেয়েছিলেন তারা সুস্থ সবল সোনার চাঁদ ছেলে প্রসব করেন। আর বাকি দুই রানি প্রসব করেন মনুষ্যেতর জীব বানর ও পেঁচা (বুদ্ধু ও ভূতুম)। ক্রমে রাজার সাত ছেলেই বড় হতে থাকে। হঠাৎ একদিন এই রাজার দেশে এক 'শুকপঙ্খী' নৌকা এসে তীরে ভীড়ে। সেই নৌকায় বসেছিল এক রূপসি রাজকন্যা। রাজকন্যা জলে ভেসে যেতে যেতে সমস্ত ছেলেদের মাকে জানায় -

"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
আনতে পারে মোতির ফুল, ঢোল-ডগর,
সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।"[৩]

রাজকন্যার উক্তিটির থেকে বোঝা যায় যে, তার নাম কলাবতী। এই রাজকন্যার জন্য যে মোতির ফুল, ঢোল, ডগর নিয়ে আসবে, কলাবতী সেই পুরুষেরই বাঁদী হয়ে থাকবে। এই মেঘ বরণ চুল ও কুঁচবরণ কন্যাকে কেন্দ্র করেই পাঁচ রাজপুত্র ও বুদ্ধু-ভূতুমের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। শেষে নানারকম বিপদ অতিক্রম করে বুদ্ধু বিজয়ী হয়। অতএব রাজকন্যা কলাবতীর শর্তানুযায়ী বুদ্ধু সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধু তার স্বামী হবার যোগ্য। কিন্তু বুদ্ধু ছিল বানর। রাজকন্যা আসন্ন বানর স্বামীর কথা জানতে পেরে চমকে ওঠে। কলাবতী চমকে উঠলেও তার করার কিছুই ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই বুদ্ধুকে তার বিয়ে করতে হয়। একদিন বুদ্ধু কলাবতীকে জিজ্ঞেস করে -

"... রাজকন্যা এখন তুমি কার?
রাজকন্যা বলিলেন, - আগে ছিলাম বাপের মায়ের, তারপরে ছিলাম আমার; এখন তোমার।"[৪]

উল্লিখিত উক্তিটির মধ্যে শৃঙ্খলিত নারী জীবনের প্রকৃত সত্য আভাসিত হয়েছে। রাজকন্যার জীবন ও তার ব্যতিক্রম নয়।

আমরা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পটি পড়ে জানতে পারি যে, রূপকথা হল সম্ভব–অসম্ভব, কল্পনা-বাস্তব ও লৌকিক-অলৌকিকের মেলবন্ধন। কিন্তু রূপকথার অধিকাংশ গল্পগুলিতে নারী বঞ্চনার চিত্র সুস্পষ্ট। যেমন আমাদের সামনে প্রথমেই সতীন সমস্যার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। রূপকথার গল্পের বেশিরভাগ রাজারই একাধিক রানি থাকত, তাদের মধ্যে কয়েকজন রানি থাকত মহাসুখে আর কয়েকজন রানির কপালে জুটত দাসী, বাঁদী কিংবা ঘুঁটে কুড়ুনির অভিধা। বুদ্ধু - ভুতুমের মাও স্বামী এবং সতীনদের নানা রকম অত্যাচার সহ্য করেছে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের একমাত্র চাহিদা ছিল –

"স্বামী তুমি, গতি তুমি, – দাসী, তোমারি ঘর করিয়াছি, বল স্বামী তুমি আমায় পুষিবে?"[৫]

চিত্তরঞ্জন রায়ের *চিরকালের রূপকথা* গ্রন্থটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি আরব্য কাহিনির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ছোট ছোট গল্প কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থের 'দৈত্য রাজকন্যা', 'তিন কন্যার কাহিনী' -তে বেশ কিছু রানি চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। লেখকের কথা অনুযায়ী উক্ত গল্পের নারীরা ছিল রূপে-গুণে অতুলনীয়–

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 11
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "নৌরোন্নিসা তিলে তিলে বড় হতে থাকে তার রূপের ডালি নিয়ে। তার রূপের আলোয় রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয়ে উঠল।"[৬]

বিশ্বের প্রায় যে কোনো সাহিত্যেই মেয়েদেরকে রূপ-গুণের আকর হিসেবে গড়ে তোলা হয়। যেমন- আরব্য রচনা, চীনের রূপকথা কিংবা জার্মানি রূপকথায় নারীদের রূপ-গুণকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাছাড়াও আমরা অধিকাংশ সাহিত্যিকের রচনায় দেখি যে, তাঁরা নারী চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে যেন তাদেরকে একটু বেশি যত্ন সহকারে রূপসি হিসেবে অঙ্কন করার চেষ্টা করেন। সাহিত্যিকদের এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র প্রাচীনযুগের সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং একালের সাহিত্যেও মেয়েদেরকে রূপসি করে নির্মাণ করার প্রবণতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চৈতালি* (১৩০৩) কাব্যগ্রন্থের 'মানসী' কবিতায় দেখি যে –

> "শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
> পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
> আপন অন্তর হতে। বসি কবিগন
> সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
> সঁপিয়া তোমার পরে নতুন মহিমা
> অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।"[৭]

এই কবিতাটিতে শুধু বিধাতা নয়, পুরুষ হয়েছে নারীর দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ পুরুষ নিজের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়েই নারীকে সুন্দর ও মধুর করে সৃষ্টি করে থাকেন। ফলত সাহিত্যের যে কোনো শাখায় কিংবা ছোটদের রূপকথায়ও মেয়েদেরকে সুন্দরী করে নির্মাণ করার প্রবণতা দেখা যায়। আর অধিকাংশ পুরুষেরা মেয়েদের রূপে মোহিত হয়ে তাদেরকে বিয়ে করেন। বাকি কুৎসিত বা রূপহীন মেয়েদেরকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দুষ্টু, ডাইনি কিংবা রাক্ষসী বলে অভিহিত করে অবহেলা করতে থাকেনি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রূপহীন মেয়েদের যে কোনো মূল্য নেই তার একাধিক প্রমাণ বর্তমান সাহিত্যেও লক্ষ করা যায়। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতায় এক কালো কুচ্ছিত মেয়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে –

> "এ গলির এক কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
> রেলিং এ বুক চেপে ধরে
> এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল -
> ঠিক সেই সময়ে চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
> আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!"[৮]

মেয়েটি কালো ও কুচ্ছিত বলে তার বিয়ে হচ্ছে না। একদিন সে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেই সময়ই তার গায়ে এসে উড়ে বসল এক প্রজাপতি। কিন্তু কালো মেয়েটি জানত যে, এই সমাজে তার শুভ পরিণয় প্রায় অসম্ভব। তাই সে অভিমানে 'দড়াম' করে দরজা বন্ধ করে দেয়। কারণ মেয়েটি মনে করছে সমাজের অন্যান্য মানুষের মতো 'প্রজাপতি'টিও তার রূপ নিয়ে তাকে বিদ্রুপ করছে। কবি এভাবেই সমাজকে বিদ্রুপ করেছেন এবং সমাজের অসাম্যের জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন।

আমরা রূপকথায় নারী বঞ্চনার দিকটিকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ত্রিভঙ্গ রায়ের *রাঙাদির রূপকথা* (১৯৭০) গ্রন্থের 'সাত মায়ের এক ছেলে' গল্পটির আলোচনা করছি। গল্পটির শুরুতেই দেখি এক রাজার এক বিশাল রাজ্য। সেই রাজ্যে ধন - দৌলত, সৈন্য - সামন্ত ও প্রজাপরিজনে ভরা। কিন্তু রাজার মনে শান্তি ছিল না, কারণ রাজা ছিলেন অপুত্রক। তাদের একটি পুত্রের আশায় দিনের পর দিন কাটে, রাতের পর রাত কাটে। তবুও সাত রানির মধ্যে এক রানিরও পুত্র হয় না। ফলত–

"রাজার মনে দুঃখের ছায়া, সারা রাজ্য দুঃখের হাওয়া।"[৯]

আলোচ্য গল্পটি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুত্ররাই হচ্ছে বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তাই প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পুত্ররাই অনাদিকাল ধরেই পিতার বংশ রক্ষা করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। আর এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী নারীদেরকে হীন, অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা করেছে। নারীত্বের এই নির্মাণ সর্ব ধর্মের সমাজের মধ্যে একইভাবে জায়মান।

ইন্দিরা দেবীর *কিশোর গ্রন্থাবলী* গ্রন্থের 'একটি মহাজীবন' গল্পে দেখি যে, চম্পানগর রাজ্যে এক গরীব ব্রাহ্মণ বাস করতেন। একদিন তার ঘরে দুধে আলতা মেশানো রং নিয়ে এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্ম নেয়। পিতা শখ করে কন্যাটির নাম রাখেন সুভদ্রাঙ্গী। একদিন সুভদ্রাঙ্গীর বাবা তার ভাগ্য গণনা করে জানতে পারেন যে, এই মেয়ে কোনো সাধারণ মেয়ে নয় বরং ভবিষ্যতে তার ছেলে হবে অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের অধীশ্বর। এদিকে সুভদ্রাঙ্গী কৈশোরে পা দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বাবা কিশোরী মেয়ে সুভদ্রাঙ্গীকে নিয়ে পাটুলিপুত্রের রাজদরবারে উপস্থিত হন। সেখানে ব্রাহ্মণের অনুরোধে পাটুলিপুত্রের রাজা এই নবাগতা মেয়ে সুভদ্রাঙ্গীকে রাজ-অন্তঃপুরে স্থান দিলেন। পরে শুভক্ষণ দেখে মগধরাজ সুভদ্রাঙ্গীকে বিয়ে করেন। বিয়ের দু'বছর পর রানি এক শিশুপুত্রের জন্ম দেয়। এই নবজাতক শিশু পুত্রটি দেখতে যেমন ছিল কুৎসিত, তার আকৃতিও ছিল তেমনি কদর্য। শিশু পুত্রের এই বিকৃত রূপ দেখে রাজা নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গী পরম স্নেহে পুত্রকে লালন পালন করতে লাগলেন। তবু এই অসহায় মা রাজার কাছে কোনো অভিযোগ জানালেন না। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের পরনির্ভরশীল করে রাখে। কৈশোরে যখন তার পিতা তাকে এক অপরিচিত পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে যায় তখনও তিনি কিছু বলতে পারেননি। আবার পরে যখন তার স্বামী নিজ সন্তানকে কুৎসিত বলে পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, সেই সময়ও তিনি চুপ ছিলেন। কারণ সমাজ শিখিয়েছে স্ত্রীদের কাছে স্বামীই হলেন দেবতা। তাই মেয়েদেরকে স্বামী দেবতার মন বুঝে চলতে হবে। যে কোনো কাজকর্ম চিন্তা-ভাবনায় স্বামীই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য। এভাবেই রানি সুভদ্রাঙ্গীও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত শিক্ষাকে সারা জীবন মেনে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

ক্রমে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা রূপকথার চিরাচরিত লিঙ্গ বৈষম্যময় সমাজের গাঢ় ধারণাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে নারী চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই ধারার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন নবনীতা দেবসেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাঁর 'রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী' গল্পটির উল্লেখ করছি। গল্পটির শুরু হয়েছে রাজকুমার বৃষস্কন্ধকে দিয়ে। রাজার একমাত্র ছেলে বৃষস্কন্ধ। সে ছোটবেলায় মাকে হারায়। তাই রাজার আদরে আদরে তার স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। পুত্রের এই বদস্বভাবের জন্য রাজ্যের কেউ তাকে পছন্দ করে না। ফলত রাজা নানা রকমের লোভ দেখিয়েও আশেপাশের রাজ্যের কোন মেয়েকেই বৃষস্কন্ধকে বিয়ে করার জন্য রাজি করাতে পারলেন না। একদিন রাজার মালি এসে তাকে জানায় যে, তার ছোট মেয়ে শ্রীময়ী রাজার অবাধ্য পুত্রকে বিয়ে করতে রাজি। তবে এই বিয়েতে শ্রীময়ীর একটি শর্ত আছে –

"...তাকে একশো নিজস্ব দাস-দাসী, আর এক হাজার নিজস্ব সৈন্য সামন্ত দিতে হবে।"[১০]

রাজা এক বাক্যে শর্তটি মেনে নেন। শ্রীময়ীর যেমন রূপ, ঠিক তেমনি তার বুদ্ধিও ছিল। তাই অন্যান্য মেয়েরা যখন রাজপুত্রকে বিয়ে করতে অসম্মত ছিল, ঠিক তখনই শ্রীময়ী হাসিমুখে বৃষস্কন্ধের গলায় মালা পরিয়ে রাজ্যের যুবরানি হয়ে গেল।

বিয়ের পরদিন থেকেই বৃষস্কন্ধ শ্রীময়ীকে সকাল বিকাল মারতে শুরু করে। মুখ বুঝে শ্রীময়ী স্বামীর সমস্ত মার সহ্য করে। কিন্তু সাথে সাথে স্বামীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা করতে থাকে। পরে ঘটনাচক্রে বৃষস্কন্ধ একদিন বিপদে পড়ে। তখন স্বামীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পুরুষের বেশ ধরে শ্রীময়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এমনকি পূর্ব পরিকল্পনা মতো সওদাগরকে বোকা বানিয়ে তার সিংহাসন লাভ করে এবং বৃষস্কন্ধকে উদ্ধার করে। শ্রীময়ীর এই অসামান্য বুদ্ধি দেখে রাজা (শ্বশুর) তাকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী করে। একদিকে একটি মেয়ের স্বামী চাষবাস করছে আর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 11
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্যদিকে তার স্ত্রী নিজের যোগ্যতা দিয়ে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। এই স্থানেই লেখিকা নবনীতা দেবসেন লিঙ্গ বৈষম্যময় সমাজের চিন্তা ধারাকে আঘাত করেছেন। প্রথাগত ধারণাকে ভেঙে এক নতুন আখ্যান নির্মাণ করেছেন, যেখানে–

> "রাজা, রাজপুত্রেরা আর নায়ক নন। ভুল ভ্রান্তিভরা সাধারণ মানুষ। রানিরা আর রাজকন্যেরা দুর্বল নন, অসহায় নন, তাঁরাই সক্ষম।"[১১]

যাতে করে শিক্ষার গোড়াতেই ছোটরাও বুঝতে শিখবে যে, এই নির্মাণগুলি নিতান্তই সামাজিক নির্মাণ। অর্থাৎ সাহসিকতা শুধু পুরুষদের গুণ নয়, মেয়েরাও সাহসী হতে পারে। দুর্বলতা শুধু মেয়েদের বৈশিষ্ট্য নয়, দুর্বল পুরুষও হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা হল রূপকথা। রূপকথার এই গল্পগুলি বহু সময় ধরে শিশু-কিশোরদের জ্ঞান তৃষ্ণা মিটিয়েছে। তাদের মনকে এক নির্মল আনন্দের সন্ধান দিয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, শিক্ষা এবং সাহিত্যের উপর সবার সমান অধিকার আছে। কিন্তু রূপকথার জগতের গোড়া থেকেই নারীরা বারবার অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি এই উপেক্ষা সমানভাবে বজায় আছে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এই গবেষণা নিবন্ধটির অবতারণা করেছি। কারণ আমরা সবাই চাই –

> "নারী-পুরুষের সামাজিক অসাম্য ঘোচাতে, নারীর আত্মনির্ভরতার প্রতি সম্মান জাগাতে এই দৃষ্টিভঙ্গি জরুরী। আমরা চাইবো সমাজে ছেলেমেয়েরা সমান সম্মান ও সমান সুযোগ পাক। নতুন যুগের মূল্যবোধগুলি এই নতুন যুগের ভাবনায় গোড়া থেকেই বুনে দেওয়া দরকার।"[১২]

আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যিকেরা তাদের রূপকথায় নারী চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করে এক লিঙ্গ বৈষম্যহীন সাহিত্য সৃজন করবেন। তাহলেই সাহিত্যে পুরুষদের সাথে সাথে মেয়েরাও পাবে সমসুযোগ-সমসম্মান ও সমানাধিকার।

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, *বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ* (১৮০০ – ১৯০০), কলকাতা, ডি. এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬, পৃ. ২২
২. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, *দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রচনাসমগ্র,* 'জীবনালেখ্য', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪২১, পৃ. ৪
৩. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুরমার ঝুলি,* 'কলাবতী রাজকন্যা', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১৫ পৃ. ৩৬
৪. তদেব, পৃ. ৪৫
৫. মিত্র, মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র,* 'মধুমালা', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪২১, পৃ. ৩৩৭
৬. রায়, চিত্তরঞ্জন, *চিরকালের রূপকথা,* 'দৈত্য রাজকন্যা ও রাজপুত্র' প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জ্যোতি প্রকাশন ১৩৬৭, পৃ. ১
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড,* 'মানসী', পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬২, পৃ. ৩৬
৮. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড,* 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ১৬২
৯. রায়, ত্রিভঙ্গ, *রাঙাদিদির রূপকথা,* 'সাত মায়ের এক ছেলে', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭০, পৃ. ৭
১০. দেবসেন, নবনীতা, *ইচ্ছামতী,* 'রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স,

প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১২৫
১১. দেবসেন, নবনীতা, *রূপকথা সমগ্র*, ‘রূপ ও কথা অংশ’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পত্রভারতী, ২০১৩, পৃ. ৪
১২. তদেব, পৃ. ৪